শিক্ষা সমাজ দেশ

এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে!

– ড. হাসনান আহমেদ

অন্তবর্তীকালীন সরকারপ্রধান ১১ সেপ্টেম্বর '২৪ দ্বিতীয় ভাষণ দিলেন। ভাষণ শোনার জন্য সন্ধ্যার পর থেকেই আগ্রহ নিয়ে বসেছিলাম। বিগত এক মাসে তার টিম যে কাজগুলো করেছে, তার বর্ণনা তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন। ৬টি কমিশন গঠন করেছেন, ভালো লাগলো। এতদিনের পচা জঞ্জাল সহজেই সরানো যাবে, স্থিতিশীলতা আনা যাবে বলে মনে করি না। বর্তমান সরকারের হাতে আলাদিনের চেরাগ নেই যে, 'হও' বললেই সব হয়ে যাবে। এক দিকে মন দিতে যাবেন, অন্য দিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। অপশক্তি পিছে গোপনে ক্রিয়াশীল। কথায় আছে, 'মঘা এড়াবি কয় ঘা'! যারা পতিত সরকারের কাঁধে ভর করে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এতদিন দেশ লুটে খেয়েছে, তাদের কোনো ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ; দেশ থাকলো, কি বিক্রি হয়ে গেল, এ আত্মজিজ্ঞাসা, বিবেকবোধ, মনুষ্যত্ববোধ নেই। তারা নিজ স্বার্থ ছাড়া কোনো কিছুই বুঝতে চাইবে না। এখানেই অসুবিধা। তারা তাদের দলবলকে বিভিন্ন অন্যায় দাবিদাওয়া নিয়ে কৌশলে লেলিয়ে দিচ্ছে। পেছন থেকে কেউ কলকাঠি নাড়ছে। আমি অনেক বছর আগে গুলিস্তানে পকেটমারদের আস্তানায় গিয়ে অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তারা সবাই একটা না একটা কারণ দেখিয়ে নিজেদেরকে ভালো প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। পতিত সরকার দীর্ঘ ষোলোটা বছরে এসব 'চাটার দল' প্রতিটা সেক্টরে, সমাজজীবনের প্রতিটা পর্যায়ে, জীবনের মন্দাকিনী তীরে বসিয়ে রেখেছে এবং তারা এদেশের অর্থনীতির অপুষ্ট-মাংসহীন হাড় অনবরত চেটে চলেছে। বড় অংকের ঋণের টাকাও পেটে পুরেছে। তাদের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যত ভালো কথাই বলুক না কেন, তারা এগুলো শুনতে চাইবে না। 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী'। দেশ-বিধ্বংসী এই অপশক্তিকে যে কোনো মূল্যে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। এটাই প্রথম কাজ। এর কোনো বিকল্প নেই। এখানে আপস করতে গেলেই সরকার পরিণামে ভুগবে, কালসাপকে বিশ্বাস করার মাসুল দিতে হবে। সরকারের ব্যর্থতায় মূলত মাসুল দিতে হবে ছাত্র-জনতাকে, যারা রক্ত ও জীবন দিয়ে সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। একটা বিষয় সরকারকে বুঝতে হবে যে, ময়লা-আবর্জনার দু-পিঠেই সমান গন্ধ। সরকারকে আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে, সভ্য ও সুশিক্ষিত লোককে সম্মান করলে, তিনি সম্মানের মর্যাদা বুঝবেন; বাঁদরকে লাই দিলেই মাথায় উঠে বসে থাকবে, তাকে বেশি সম্মান-মর্যাদা দেখানো চলবে না; খ্যাপা কুকুরকে মুগুর দিতেই হবে। নইলে সুযোগ বুঝে সে বিষদাঁত বসিয়ে দেবে। সেজন্য সরকার সবার প্রতি নমনীয় না হয়ে অপরাধী, দুর্নীতিবাজ, দেশের রক্তচোষা, খুন-অপকর্মের পরীক্ষিত দোসরকে যথাযথভাবে চার্জ গঠন করে বিচারের আওতায় আনতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। যত দেরি হবে, তত ক্ষতির কারণ হবে।

তেপ্পান্ন বছর পর এদেশের এই অতি প্রতীক্ষিত ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে আমি 'বিপ্লব' শব্দের কোনো বাংলা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করতে চাই না। বিপ্লবকে বিপ্লবের মতোই দেখতে, সেমতো কাজ করতে হবে। জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে শরীরের ক্যান্সার আক্রান্ত যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্ত্রপচার করে বিচ্ছিন্ন করা সময়ের দাবি। এখানে কোনো উদারতা ও নমনীয়তা প্রশ্রয় দেওয়ার অবকাশ নেই। এদেশে রং বদল করা অপশক্তির অভাব নেই। সরকার সমাজের সবাইকেই যেভাবে মানুষ হিসেবে ভাবছেন, আমি সবাইকে মানুষ ভাবতে নারাজ, কারা মানুষ আর কারা মানুষ নামের কলঙ্ক, এতটা বছরের কর্মকাণ্ডে আমরা নিশ্চয়ই সবাইকে চিনে ফেলেছি। এখন ব্যবস্থা নেওয়ার পালা। আমি তো আপাতত নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্মকাণ্ডে নমনীয় ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি। সব অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না। তাদের বিচারের জন্য গ্রেফতার দেখানো ও শক্ত মামলা রুজুর ব্যবস্থার গতি ধীর হয়ে যাচ্ছে। এতে বিপ্লবের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। অনেককে বদলি করে অন্য কোথাও

দেওয়া হচ্ছে, অনেককে স্বেচ্ছা-অবসরে পাঠানো হচ্ছে। তাদের কৃত-অপকর্ম ও দুর্নীতির বিচার গেল কোথায়? যে-সব সরকারি আমলা-কামলা, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা দেশের বিভিন্ন পদে থেকে দেশ লুটে খেয়েছে, তাদের স্বেচ্ছা-অবসরে পাঠালে তাদেরই লাভ, এতদিন যে কোটি কেটি টাকা অবৈধভাবে কামাই করেছে, এখন বসে বসে খাবে আর ষড়যন্ত্র করবে। তারা তো এটাই চায়। তাদের প্রাপ্য শাস্তি গেল কোথায়? এর নাম বিপ্লব নয়। আয়নাঘর ভেঙে দেওয়ার কথা শুনছি। আয়নাঘরের মালিক-কুশীলবদের হিসেব কোথায়? তাদের নামগুলো তালিকা আকারে এতদিনেও পত্রিকার পাতায় এলো না কেন? তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও গ্রেফতারের আওতায় কতজনকে আনা হয়েছে, পত্রিকার মাধ্যমে জানতে চাই।

'গোপালী পুলিশ', 'গোপালী পুলিশ' শব্দ সব জায়গা থেকেই কানে আসে। গোপালগঞ্জ এলাকার কোনো ব্যক্তি মেধা ও যোগ্যতার বলে কোনো পদে নিয়োগ পেলে কোনো অন্যায় তো আমি দেখি না। যদি কাউকে পক্ষপাতিত্ব করে, অন্য কোনো এলাকার যোগ্য কাউকে বঞ্চিত করে অযোগ্যকে অন্যায়ভাবে নিয়োগ বা পদায়ন করা হয়, তা নিশ্চয়ই অন্যায়। এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানি না। তবে ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনীকে পক্ষপাতিত্ব করে পুলিশ বিভাগে চাকরি দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে বলে শুনি। জরুরি ভিত্তিতে এর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। পূর্বেও বেশ কয়েকটা লেখাতেই পুলিশ বিভাগ ও র‍্যাবকে অতি তাড়াতাড়ি ঢেলে সাজানোর কথা আমি বলেছি। সময় নষ্ট না করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজটা করা জরুরি। বুঝতে হবে 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। বরং ৬টা কমিশন গঠন করার আগেই কাজটা করার দরকার ছিল। দেশের স্থিতিশীলতা আনতে বা কোথাও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বারবার ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার করা ঠিক হবে না। তাদেরকে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে বলুন। তাদেরকে 'রিজার্ভ ফোর্স' হিসেবে ব্যবহার করাই ভালো। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজ তাদেরকেই করতে হবে। তাদের কেউ যথাসময়ে কাজে যোগ না দিলে বা আইন প্রয়োগে ব্যর্থ হলে, তাকে বিদায় করে দেওয়াই ভালো। কাউকে তোষামোদ করে কাজ করাতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। বুঝতে হবে দীর্ঘদিন অপশাসন, দুর্নীতি ও বিকৃত মানসিকতার মহোৎসবের ফলে আমাদের সমাজ, সমাজের মানুষ ও মানবিক মূল্যবোধ অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। সব ক্ষেত্রে সময়োপযোগী কাজ করাটাই দরকার। এখন প্রয়োজন শক্ত হবার। সেজন্য বিষয়গুলোকে মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তাভাবনা করে দেখা প্রয়োজন। বিপ্লব আকারেই বিবেচনা করতে হবে। অনেক কিছুর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। অনর্থক দেরি, বা আগের কাজ পরে করার চেষ্টার ফলে অনেক কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

'৭৫-এর পট পরিবর্তনেরও অনেক যৌক্তিক কারণ ছিল, তা আমরা যতই স্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড বলে বিষয়টাকে গণ্য করি না কেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার একটা বড় ভুল ছিল, গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার কথা ভেবে, বাকশালকে তাড়াতাড়ি আওয়ামি ছদ্মাবরণে রাজনীতি করার সুযোগ অবারিত করে দেওয়া। বাকশাল একটা প্রতিষ্ঠিত বিকৃত মতবাদ। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময়ে অনেকবার সামরিক কূ করার চেষ্টা হয়েছিল, আবার তিনি জীবন দিয়ে তার ভুলের খেসারত দিয়ে গেছেন। একই ভুল সম্ভবত আমরা আবার করতে যাচ্ছি। আমরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতায় দেখলাম যে, আওয়ামিলীগের অর্ন্তর্নিহিত বাকশালী খসলত বদল হয়নি, বরং বহুগুণে বিকৃতরূপে আধুনিক পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমড়া গাছ থেকে সুমিষ্ট আম আশা করি কি করে? একজন নিরব দর্শক হয়ে নির্মোহভাবে এই তেপ্পান্ন বছর ধরে তা দেখে চলেছি। বাকশালের শেকড় পার্শ্ববর্তী দেশের মাটিতে পোতা। পাশ্ববর্তী দেশ পতিত শেখ হাসিনাকে তাদের স্বার্থ দেখভালের জন্য এদেশে পাঠায়, তাদের কর্মকাণ্ডে জনসাধারণ খ্যেপে গেলে আবার ফেরৎ নেয়।

মনে পড়ে, আমি 'ট্রান্সপ্যারেন্সি ও গভর্নেন্স' বিষয়ে পিএইচডি করার সময় ছুটিতে দেশে এসেছি। আমার এক পুরোনো সহকর্মী একদিন দেখা করতে এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'স্যার, আপনাদের এইসব টপিক বাদ দিয়ে

আওয়ামিলীগের শ্রেণিচরিত্র নিয়ে একটা গবেষণা করতে পারেন না'? আমি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললাম ,'আপনারা সমাজবিজ্ঞানের লোক, ইচ্ছে করলে বষয়টি নিয়ে ভেবে দেখতে পারেন, নিজেই গবেষণা করতে পারেন'। সেদিন থেকে বিষয়টা আমার কাছে বেশি গুরুত্ব পেল। আমি তাদের শ্রেণিচরিত্র উদ্ঘাটনে মনে মনে ব্রতী হলাম। আসলেই আমাদের সমাজে একটা কথা বেশ প্রচলিত, 'তোমার ঘাড় কেন কাত? আমরাই এক জাত'। কোনো স্বাধীন ব্যক্তির কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদানের মনোজাগতিক ইফেক্ট তো অবশ্যই আছে। নইলে একরঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো একজায়গায় জড়ো হয় কীভাবে? এছাড়া কতিপয় সুবিধাবাদী বাঙালি দেশাত্ববোধ, নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে স্বার্থ হাসিলের জন্য সেখানে গিয়ে অতি উৎসাহী হয়ে মিছিলের আগে স্থান করে নেয়, বড় বড় কথা বলে, পদ-পদবি সংগ্রহ করে, এটাও সত্য।

এরশাদ সরকার থানাগুলোকে উপজেলা করেছিলেন। উপজেলা করার জ্বালা আজও মেটেনি। থানা পর্যায়ে পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এখনও বিদ্যমান। লাভ কতটুকু হয়েছে, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অনেক ভালো বলতে পারবেন। তবে রাজনৈতিক যন্ত্রণা বেড়েছে, এটা সত্য। আমাদের পুরো দেশকেও শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির বাসনায় ভেঙেচুরে ৫টি প্রদেশে ভাগ করার মনোভাব কারো কারো মনে বিদ্যমান। শেখ হাসিনা ওয়াজেদও বলেছিলেন, মেট্রোপলিটন ঢাকাকে ভেঙে ৪ বা ৮ টুকরো করতে পারলে তার কাছে ভালো হতো। টাকার অভাবে দু-টুকরো করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। আমাদের দেশ এত বিশাল আকারের কোনো দেশ নয়। রাজনৈতিকভাবে যত টুকরো করবেন, রাজনৈতিক জটিলতা ও আঞ্চলিক বৈষম্য তত বাড়বে। অপরাজনীতির খেলা, মেরেকেটে খাওয়া, দলবাজি তত প্রকট হবে। স্ট্রাটেজিক দিক থেকে দেশের অখণ্ডতা তত দুর্বল হবে। আমাদের দেশ পরিচালকদের অনেক দূরদর্শী হতে হবে। 'নেই কাজ তো খই ভাজ' হলে চলবে না। দেশের উন্নতির এতই যদি অদম্য ইচ্ছা থাকে, এদেশের ৮টি বিভাগকে আয়-কেন্দ্র, ব্যয়-কেন্দ্র, বিনিয়োগ ও উন্নয়নকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা যায়। জেলা ছাড়া বিভাগকে তো আমরা বাস্তবে বড় করে দেখি না, উন্নয়নের জন্য গুরুত্বও পায় না। সেখানে আমরা যোগ্য নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে উন্নতি করতে পারি। তবে রাজনৈতিক প্রশাসন আর বাড়ানো ঠিক হবে না। এদেশে রাজনৈতিক প্রশাসন পচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই দুর্গন্ধকে কত তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দেওয়া যায়, সেটা দেখুন। কীভাবে সুস্থ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে জাতে ওঠানো যায় সেটা করুন। এতে দেশের মঙ্গল হবে। এ বিষয়ে গত ১০.০৯.'২৪ তারিখ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার, না সুপ্রিম কাউন্সিল?' শিরোনামে একটা বিকল্প নতুন কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা এই কলামেই পরামর্শ দিয়েছিলাম, ভেবে দেখুন। আমার মনে হয় এমন ব্যবস্থা কোনো না কোনো দেশে থাকতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা যথাযথ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হয় কীনা, রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যায় কীনা, এটাই দেখার বিষয়। এখন অপরাজনীতি প্রতিপালন আর দরকার নেই, দরকার অপরাজনীতি দমন ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সার্থক প্রয়োগ, যা নিয়ে একটা কমিশন ইতোমধ্যেই গঠন করা হয়ে গেছে। সর্বাগ্রে দরকার কতকগুলো সরকারি বিভাগকে ঢেলে সাজানো, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দুষ্কৃতিকারীদের শক্ত হাতে দমন এবং সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা স্থায়ী সুনীতির ওপর প্রতিষ্ঠা করার সফল প্রচেষ্টা। সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা সুনিশ্চিত, তো জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত, অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধ। অর্থাৎ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করা সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এ নিয়ে পঞ্চাশোর্ধ নিবন্ধ এ পত্রিকাতেই লিখেছি, বারান্তরে আরও লেখার ইচ্ছে আছে। ছোটবেলায় পড়া আমাদের সবারই মনে আছে, 'আমাদের দেশে হবে সে-ই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'।

(১৮ সেপ্টেম্বর '২৪ দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ